অপ্রতিম চক্রবর্তী

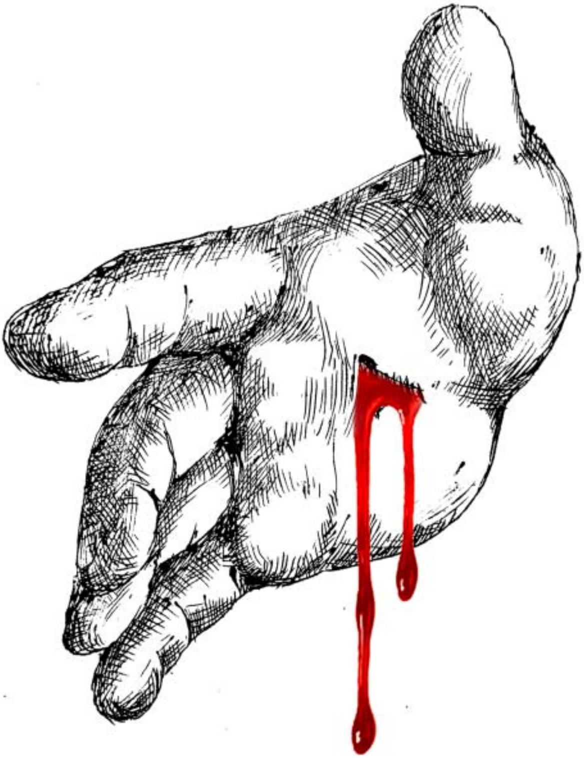

মানবপুত্র

মানবপুত্র

অপ্রতিম চক্রবর্তী

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২৫ ডিসেম্বর ২০২০
বড়োদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হল

'মানবপুত্র'

লিখন
অপ্রতিম চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

আলোকচিত্র ও সম্পাদনা
সৈকত মুখার্জি

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

“This world is wild as an old wives’ tale
And strange the plain things are,
The earth is enough and the air is enough
For our wonder and our war;
But our rest is as far as the fire-drake swings
And our peace is put in impossible things
Where clashed and thundered unthinkable wings
Round an incredible star.

To an open house in the evening
Home shall men come,
To an older place than Eden
And a taller town than Rome.
To the end of the way of the wandering star,
To the things that cannot be and that are,
To the place where God was homeless
And all men are at home.”

G. K. CHESTERTON

BIBLIA,

Ad vetustissima exemplaria castigata.

Quid in horum Bibliorum castigatione præstitum sit, subsequens præfatio latiùs indicabit.

ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini.

M. D. LXVII.

CVM PRIVILEGIO.

১

তখন পনশাস পাইলেট প্রশ্ন করলেন, “বলো বন্দি, কী তোমার অপরাধ, যে ইহুদি যাজকেরা তোমার প্রাণদণ্ড চায়? তুমি কি নিজেকে সত্যই রাজা বলে মনে করো নাকি?”

জেরুসালেমের আকাশে আজ সকাল থেকেই রক্তমেঘ। অথচ, আজ মেতে ওঠার দিন। মাঝেমাঝেই শোনা যাচ্ছে মেঘের

গর্জন। বৃষ্টি নামবে। সমবেত সেনা ও যাজকদের মুখেও মেঘ। পাইলেট আবারও জিজ্ঞাসা করেন, এবার ঈষৎ অধৈর্য, "তুমি কি ইহুদিদের রাজা?"

একবার, শুধু একবারই স্রষ্টা আলো চেয়েছিলেন। অথচ আঁধার রয়ে গেল। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল। ঈশ্বর তখন বাক্য ছিলেন। সেই শঙ্খশব্দহীন আঁধারে কাল জেগে ছিল। কালান্তর শেষে, মরুঝড় পেরিয়ে এল বিষণ্ণ এক পাগল। সে সুসংবাদ এনেছিল। বলেছিল—সে অরণ্যে রোদন ভালোবাসে। তৃষ্ণার্ত মানুষকে সে দিয়েছিল জলের সন্ধান।

উত্তর দেওয়ার আগে বন্দি মুখ তুলে সূর্যকে দেখে। আকাশে সূর্য নেই। তার মাথার মুকুটটি মানিয়েছে বেশ লাল চাদরটির সঙ্গে। রক্তের ধারা গাঢ় হয়ে নামে তার চোখে। বন্দি বিষণ্ণ হাসে। এ রক্ত বড়ো দামি, তা এরা বুঝবে না।

আরেকটু পরেই বজ্রপাত শুরু হবে। তার খিদে পেয়েছে, নীরস আলোচনা আর তার ভালো লাগে না। কাল রাতে রুটি খেয়েছিল তারা। ভাগাভাগিতে সকলেই একটুকরো করে। আজ আর খাওয়া হবে না। লোকটা আবারও জিজ্ঞেস করছে, "ওহে ইহুদিদের রাজা, তোমাকে ক্রুশে দিতে পারি জানো?"

কায়াফাসদের উল্লাসে কান পাতাই দায়। বন্দির আয়ত চোখে মায়া। সে বহুবার বলা কথাটা শেষবার বলে—

"আমিই পথ, পুনরুত্থান, ও জীবন।"

"কী বলছ হে—নিম্নকণ্ঠে?"

"তুমি কিছুই পারো না, যতক্ষণ পিতা না-চান। আমি যে ইহুদিদের রাজা তা তুমিই বললে। তবে সে তোমার

রাজত্বে নয়। সত্য'র রাজত্বে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার আসা।"

পাইলেটের অধরে ব্যঙ্গের বঙ্কিম হাসি লেগে আছে। উঠে যাওয়ার আগে তিনি বলেন, "আর—সত্য কী?"

সে এক ছুতোর মিস্তিরির সন্তান। কিংবা তা-ও নয়। গ্রিক ভাষায় 'টেকটন' শব্দটির অর্থ সু-বিস্তৃত। শুধুই 'কারপেন্টার' নয়। সে কারিগর। হ্যাঁ—এই তার পার্থিব পরিচয়। কিন্তু সে জানে সে কে। নিজের রক্তের হিন্দোলের মধ্যে সে টের পায় সৃষ্টির গর্জন। সে বুঝতে পারে এ' জগৎ তারই রচনা। তবু তার উজ্জ্বল কোষ ঘিরে রয়েছে যেন এক লাজুক উপবৃত্ত। এক তাড়িত সংবেশ—প্রেমের নোনাটান সে সর্বদা টের পায় তার এই মানবজন্ম ঘিরে। না, রাজা নয়—সে এক যথেষ্ট মানবপুত্র। এক অভিনব ঈশ্বর তার পিতা। ধুলো থেকে তিনি তৈরি করেছিলেন মানুষ। ক্রুশকাঠে নিজেকেই খুঁজেছিলেন তিনি—যখন চাঁদ ডুবে গেল। একবার, শুধু একবার আলো ভালো লেগেছিল তাঁর। সে কথা বলেছিলেন তিনি। জেরুসালেমের মাটিতে মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখা। যেদিন আবারও আরেকবার বেঁচে গেল ল্যাজারাস, সেদিন তিনি খুব আমোদিত হয়েছিলেন। কারণ, তুমিই পুনরুত্থান, আর তুমিই জীবন। তবু তো রয়ে গেল কিছু মায়া। ফিরে ফিরে আসা। আলো নিভে গেলে, তিনজন রমণী তাই গিয়েছিল ক্রুশকাঠের কাছে। রক্তাক্ত ঈশ্বরকে কাঁধ দিয়েছিল তারা।

জিশুর শেষ উত্তর শোনা হয়নি পাইলেটের, তিনি তখন সুধারসে ঈষৎ মগ্ন। সে প্রশ্ন আজ ছড়িয়ে গেছে কালান্তরের বাতাসে, শ্রমণদের সঙ্গে। কোনোদিন আবারও বালি থেকে

উঠে আসবে সে এক অন্যমনস্ক প্রফেট। চিৎকার করে বলবে, "বাতাসে কান পেতে শোনো—সময় আছে এখনও। এসো, আমি জলের খবর এনেছি। এখনও সুসংবাদ বাকি রয়ে গেছে—নষ্ট হয়নি কিছুই, যদি অনুতাপ জানো। জীবন এখনও আছে, শুক্রবার আসে ওই—আছে, আছে, আছে..."

২

বড়োদিন জিশুর জন্মদিন নয়। যদি প্যালেস্টাইনে জিশু সত্যিই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকেন, এবং যদি পঁচিশে ডিসেম্বরের রাতেই তা হয়ে থাকে, তাহলে তো অঙ্কের একটা দিক মেলে না। মেষপালকদের মধ্যে তাঁর জন্ম কথিত আছে, অথচ জুডেয়ার শীতের রাতে তারা মাঠে কেন থাকবে প্রতীক্ষারত? হিসেব মেলে না। উত্তর চাইলে আইসিস আর প্রসূনসভ্যতার দিকে চাইতে হবে। আইসিসের ছেলে ইউলের উপাসক ছিল মিশরীয়রা, আর ব্যাবিলনের সূর্যদেবতা 'তাম্মুসের' আরাধনায় পেগানদের প্রায় সমস্ত আচার-পরম্পরা রপ্ত করেছিল প্রাচীন খ্রিস্টধর্ম। পাইন গাছের গায়ে মোমবাতির আলো আর খেজুরপাতায় প্রদীপ দেওয়া তাই একই কাজ। জিশুর জন্মের দিন, এমনকি জন্মের সাল নিয়ে প্রতর্ক রয়েছে। চতুর্থ শতকের আগে অবধি পঁচিশে ডিসেম্বর তারিখটির আলাদা কোনো মাহাত্ম্য জানা ছিল না বলে অনেকের মত। বরং আরও দুই শতাব্দী লেগেছে এটিকে উৎসবের দিনে পর্যবসিত করতে। তবে শেষ ডিসেম্বরে সূর্যদেবতার আরাধনায় মেতে উঠত বহু প্রাচীন সভ্যতাই, সে ছিল শীতের মৃত্যুহিম আবরণ সরিয়ে বসন্তের আগমনী গীত।

'উইন্টার সলস্টাইস' তাই ছিল আলোয় ফেরার উৎসব। যত দিন গেছে, উৎসব হয়েছে আরও বিস্তৃত। খ্রিস্টধর্ম যখন বিস্তার লাভ করেছে পেগান সংস্কৃতিতে তখন এই দুই উৎসব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ৩৩৬ অব্দের পূর্বে রোমে বড়োদিন উদযাপনের কোনো নির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে প্রাচ্যে ৬ জানুয়ারি দিনটিকে জিশুখ্রিস্টের জন্মের সঙ্গে, আরও সঠিক ভাবে বললে তাঁর ব্যাপ্টিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করা হোত। কোথাও আবার ২৮ মার্চ তারিখটিকে জিশুর জন্মদিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবু পঁচিশে ডিসেম্বর তারিখটিই রয়ে গেল। এর একটি 'বড়ো' কারণ সম্ভবত এই যে রোমান ক্যালেন্ডার মতে ওই দিনটিই উইন্টার সলস্টাইস (যদিও কোনো তারিখেই নেই ইতিহাস-পূর্ব কোনো প্রশ্নাতীত দিকচিহ্ন। রোমান ক্যালেন্ডারের শেষ পর্বে তাই Years of confusion-কে অতীতে পর্যবসিত করে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে জুলিয়াস সিজার প্রচলন করলেন যে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার, সেখানেও ২৫ ডিসেম্বরকে 'উইন্টার সলস্টাইস' রূপে নির্দিষ্ট করতে করতে কেটে গেছে এক শতাব্দীকাল। আবার এই সৌর ক্যালেন্ডারের সংশোধন করে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরির হাতে জন্ম নিল কাল-গণনার নতুন পদ্ধতি— গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার, যার সঙ্গে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ব্যবধান ১৪ দিনের। এখনও Orthodox Church গুলি বড়োদিন পালন করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে।)

তবে, চতুর্থ শতকে সেন্ট আগাস্টাইন ২৫ ডিসেম্বরেই জিশুখ্রিস্টের জন্মদিনের সম্ভাব্যতাকে মান্যতা দিয়েছেন। "Hence it is that He was born on the day which is the shortest in

our earthly reckoning and from which subsequent days begin to increase in length. He, therefore, who bent low and lifted us up chose the shortest day, yet the one whence light begins to increase.”

সূর্যদেবতার সঙ্গে জিশুখ্রিস্টের এই সংযোগের সমর্থনে মেলে বাইবেলের বিভিন্ন পংক্তিতে। তাঁকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে “Sun of righteousness” রূপে।

আবার গুচ্ছ গুচ্ছ ভাইকিং ভ্যান্ডালরা নবান্নে ‘ইস্ত্রুর’ পুজো করছে। বরফ গলে গেলে তাদের ছোটো-বড়ো খামারে নতুন গম-বার্লি উঠেছে। প্রথম খ্রিস্টান মিশনারিরা দেখল রেজারেকশন ব্যাপারটা হেদেনদের জানাতে হবে, অথচ এমনভাবে যে তাদের নিজস্ব পরবটাও যেন বজায় থাকে। জন্ম নিল ‘ইস্টার’। আবার অন্যমতে দেখলেও ‘ইস্টার’ এসেছে ‘ইশতার’ থেকে। ইনিই নানা রূপে মিশরে আর্টেমিস, রোমে ভিনাস, গ্রিসে ডায়ানা, আরও কত কী!’

পুরোনো দেবদেবীদের সরিয়ে নতুন দেবদেবীরা এসে নিজেদের স্বকীয় জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন, এমন নিদর্শন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মিথগুলিতে আছে। এই বৃহত্তর কাঠামোতে ফেলা যায় গ্রিসে টাইটানদের সরিয়ে অলিম্পিয়ানদের আগমন, কিংবা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির যোগে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব। বি.এন. মুখার্জি তাঁর প্রখ্যাত *নানা অন দ্য লায়ন* বইতে দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্যাবিলনের নানার উপাসনা একত্রে মিশে গেছে আসিরিয়ার ইশতার বা পারস্যের অনাহিতার সঙ্গে। জৈন পরম্পরায় পরবর্তীকালে এই অনাহিতাই হয়ে উঠবেন উপাস্য।

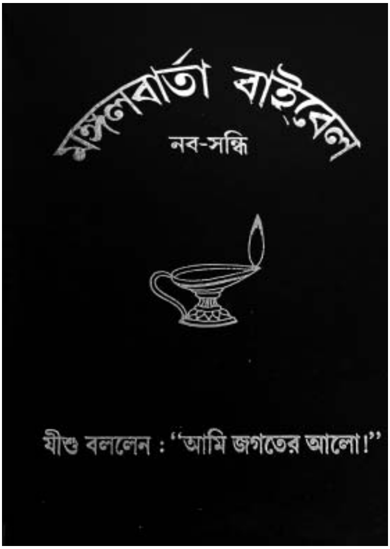

বাংলা ক্যাথলিক বাইবেল

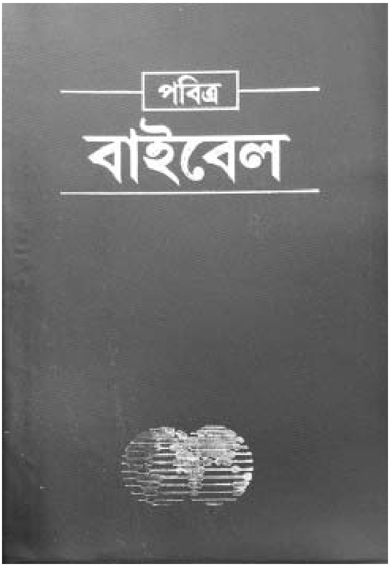

বাংলা প্রোটেস্টান্ট আধুনিক অনুবাদ

মাতৃশক্তির উপাসনা সর্বত্র, এবং তার কারণটিও বহুচর্চিত। মাতৃত্বের ধারণাটি উর্বরতার দ্যোতনা নিয়ে আসে। অতএব প্রকৃতি উপাসনার প্রাচীন পদ্ধতিগুলি অচিরেই দেবী উপাসনার বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কে চালানোর ক্ষমতা রাখেন এই মাতৃশক্তিরা। যেমন টিউটনদের দেবী 'ইস্ত্রু', যিনি একাধারে ঊষাকাল ও উর্বরতার প্রতিভূ। একই দেবতার বিসর্জন ও পুনরুত্থানের মোটিফটিও বারবার ঘুরে ফিরে আসে প্রাচীন বিশ্বাসগুলিতে। যেমন রোমে সাইবিলের প্রেমিক আত্তিসের পূজাপদ্ধতিতে প্রতি বছর তাঁকে ভাসিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। বসন্তে, অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতার সঙ্গে আত্তিসের পুনরুত্থান ঘটত—

"He was a god of ever-reviving vegetation. Born of a virgin, he died and was reborn annually. The festival began as a day of blood on Black Friday and culminated after three days in a day of rejoicing over the resurrection." (Gerald L. Berry, *Religions of the World*, 1956)

স্বাভাবিকভাবেই, খ্রিস্টীয় মতবাদে যখন আত্তিসের উপকথাটি নতুন রূপ পেল, তখন তাঁর জায়গা পেলেন জিশু। পুনরুত্থানের মোটিফটিতে আত্তিস অপসারিত হয়ে চলে এলেন জিশু, কিন্তু কার পুনরুত্থান বৈধতর, তা নিয়ে দু-দলের মধ্যে বচসা লাগল। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ততদিনে উদীয়মান সূর্য। অতএব অচিরেই তা ঢেকে দিল পুরোনো আখ্যানগুলিকে। প্রকৃতি উপাসনা থেকে বহু-ঈশ্বরবাদের যে ধারণা, সেমেটিক ধর্মের একেশ্বরবাদ তাকে নিজ রূপকল্পে গড়ে নিল। ঠিক যেমন দুর্গার

উপাসনা কল্যাণে এবং তাণ্ডবে—দুটি রূপেই আমরা দেখেছি প্রাচীন অমেয়কালের দেবীদের আলো।

৩

যে প্রগাঢ় পরাবাস্তবতায় খ্রিস্টধর্মের উৎস আবৃত, তারই কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় ভারতে এই ধর্মের আগমনে। সেই প্রাচীন পৃথিবীর প্রেক্ষিতে প্যালেস্টাইনবাসীদের কাছে ভারতবর্ষ ছিল বিশ্বের সুদূরতম এক রহস্যময় দেশ। তবু, দূরত্বও শেষ অবধি বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের 'টমাস খ্রিস্টান'-দের বহুশতাব্দী-লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতে খ্রিস্টধর্মের পদার্পণ ঘটে প্রথম শতাব্দীতে, জিশুর মৃত্যুর তিরিশ বছরের মধ্যেই। কথিত আছে জিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের পর তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশে তাঁর প্রধান বারোজন শিষ্য, যাঁদের অভিহিত করা হয় Apostle নামে, বেরিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বের নানা পথে প্রভু জিশুর দিব্যবাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে। এই সময়েই ভারতে এই খ্রিস্টীয়-বার্তা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পান জিশুর অন্যতম ভক্ত জুডাস টমাস যিনি 'যমজ' (Didymus/the Twin) নামেও পরিচিত ছিলেন। ইনিই সেই শিষ্য যিনি জিশুর পুনরুত্থানের দিন অর্থাৎ Easter Sunday-তে বাকি শিষ্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন না এবং নিজের চোখে না-দেখে এই ঘটনা বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন স্বহস্তে প্রভুর ক্ষতচিহ্ন ছুঁতে পারলে তবেই বিশ্বাস করবেন এই অলৌকিক বার্তা ("Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into his side, I will not believe", John, 20:25)। তাঁর সন্দেহ

নিরসন হয়েছিল ঠিক আটদিন পরে, যখন জিশু দ্বিতীয়বার রুদ্ধকক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের মাঝে এবং টমাসকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর ক্ষতচিহ্ন স্পর্শ করে অবিশ্বাস দূর করতে। বিস্ময়মুগ্ধ 'Doubting Thomas' মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন—"My Lord and My God"। সকল শিষ্যের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি পুনরুত্থানকে প্রশ্ন করেছিলেন, আবার সকলের মধ্যে তিনিই প্রথম—যিনি 'ঈশ্বরপুত্র' নয়, তাঁদের প্রভুকে চিনেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর রূপে।

এ হেন টমাস কিন্তু প্রথমেই ভারতে আসতে রাজি হননি। অচেনা ধর্ম, অজানা ভাষা, অদেখা সংস্কৃতির লোকজনের মাঝে কীভাবে ধর্মপ্রচার সম্ভব—এই দ্বিধা তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু এবারেও স্বয়ং জিশু-ই তাঁকে ত্রাণ করেছিলেন আত্মসংশয়ের মোহ থেকে। স্বপ্নে আশ্বাস দিয়েছিলেন—এই যাত্রায় তিনি সঙ্গে থাকবেন চিরনির্ভর হয়ে—"Don't be fearful, Thomas. Go to India and preach the Word there, for my grace is with you." (*Acts of Thomas*, *The Apocryphal New Testament*, Oxford: Clarendon Press)। এ যাত্রা, অতএব, তাঁদের দুজনের। আর কী আশ্চর্য! ঠিক এইসময়েই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রাজা গুন্দফার (Gundaphar/Gondaphorus/Gondophares)-এর কাছ থেকে আব্বান নামে এক ব্যবসায়ী এসে উপস্থিত জেরুজালেমের মাটিতে—এক দক্ষ কারুশিল্পীর খোঁজে, যে রাজার জন্য নির্মাণ করতে পারবে এক অনুপম প্রাসাদ। *Acts of Thomas*-এর কাহিনি অনুসারে এই আব্বানের মাধ্যমেই টমাসকে রাজা গুন্দফারের কাছে বিক্রয়

করেন স্বয়ং জিশুখ্রিস্ট, রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে। প্রভুর সেই ‘দান’ সম্বল করে, অতএব, টমাসের যাত্রা শুরু হল। অনেক ঝড়তুফান পেরিয়ে তাঁদের জাহাজ এসে থামল ভারতের মাটিতে যেখানে যুগ যুগ ধরে বহু ধর্ম বহু সংস্কৃতি এসে আশ্রয় লাভ করেছে আপন স্বাতন্ত্র বজায় রেখে। সেই পুণ্যভূমিতে এবার পদার্পণ ঘটল প্রথম খ্রিস্টধর্মীর—সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়। টমাস ভারতের কোন অঞ্চলে প্রথম পৌঁছেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। গুন্দফারের রাজত্ব ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলে। তবে সম্ভবত কোচির কাছে মালঙ্কারা দ্বীপে তাঁর জাহাজ ভিড়েছিল প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে। নিজ কর্মস্থলে পৌঁছে তিনি দেখলেন অতুলনীয় রাজবৈভব, পাশাপাশি দেখলেন সীমাহীন দারিদ্র্য। সালটা ৫২ খ্রিস্টাব্দ। প্রভুর নির্দেশ অনুভব করতে দেরি হল না তাঁর। রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্য তাঁর কাছে গচ্ছিত থাকা সমস্ত অর্থ অকাতরে বিলিয়ে দিলেন রাজ্যের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে, ফলে রাজরোষে নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। আবার সেই রাতেই মারা গেলেন রাজার ভাই। স্বপ্নে তিনি রাজাকে দেখা দিয়ে জানালেন, ভুল করেননি টমাস। পৃথিবীতে না-হলেও, স্বর্গে সত্যিই রাজার জন্য নির্মিত হয়েছে বিরাট এক প্রাসাদ—টমাসের পুণ্যের দানে। আপ্লুত রাজা সপরিবারে দীক্ষিত হলেন টমাসের কাছে। প্রচার শুরু হল এই নতুন মানবধর্মের। বর্তমানে তামিলনাড়ু ও কেরালার বহু প্রাচীন খ্রিস্টান পরিবারই বিশ্বাস করেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং টমাসের কাছেই। এঁরা আজও পরিচিত ‘টমাস খ্রিস্টান’ নামে। তবে অনেক সময় এঁদের ‘সিরিয়ান

খ্রিস্টান'ও বলা হয়—সে প্রসঙ্গে আমরা কিঞ্চিৎ পরে যাব। তার আগে আমরা বরং টমাসের পরিণতির দিকে মনোনিবেশ করি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম এদেশের নিম্নবর্গীয় মানুষকে দিয়েছিল আশার আলো। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিষ্পেষণে যারা এতদিন ছিল অবহেলিত, তারা এবার ঈশ্বরপুত্রকে সকাতরে ডাকার অনুমতি পেলেন এই নবধর্মের মাধ্যমে। একটি সূত্র অনুযায়ী টমাসের কাছে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন অন্তত ৬৮৫০ ব্রাহ্মণ, ২৮০০ ক্ষত্রিয়, ৩৭৫০ বৈশ্য এবং ৪২৫০ জন শূদ্র (*Oxford History of the Christian Church: Christianity in India—From Beginning to Present*, Robert Eric Frykenberg)। বলা বাহুল্য সকলে খুশি হননি। কোন যুগেই হন-না। জিশুখ্রিস্টকে যেমন নিপীড়ন করেছিল তৎকালীন ইহুদি ধর্মগুরুরা, টমাসের উপরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল একদল ধর্মান্ধ ব্যক্তি রাজা মাজদাই-এর প্রশ্রয়ে। মায়লাপুর নামে এক স্থানে শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন টমাস। মৃত্যুর পূর্বে শেষ প্রার্থনাতেও ধ্বনিত হয়েছিল প্রভুর প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ও আত্মসমর্পণ—"My Lord and my God, my Hope and Redeemer [...] I have fulfilled the work you gave me and obeyed your commands, today I receive my final freedom." (Acts of Thomas 13:167; John 20:28)। তাঁর নশ্বরদেহ সমাধিস্থ হয়েছিল মায়লাপুর চার্চে এবং খুব সম্ভবত পরবর্তী কালে তা স্থানান্তরিত হয় বর্তমান তুর্কীর অন্তর্গত Edessa Church-এ। সেন্ট টমাসের চার্চ আজও খ্রিস্টধর্মীদের কাছে এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে পর্তুগিজ মিশনারিরা এই চার্চটির নির্মাণ করেছিল অনেক

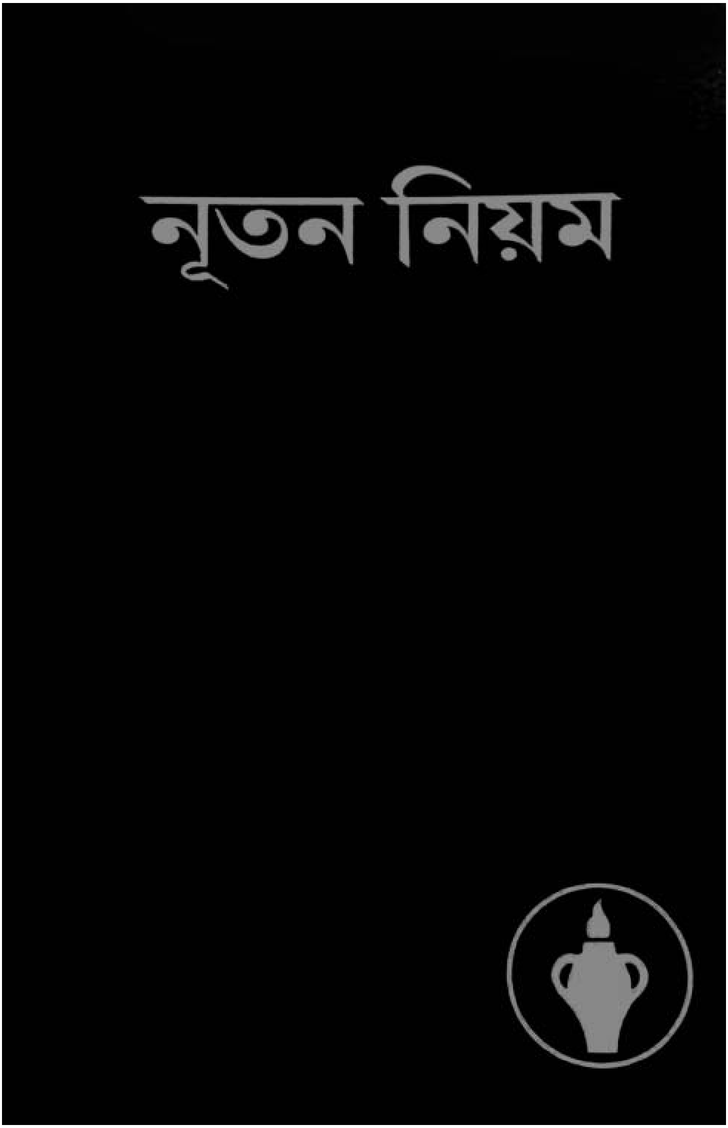

উইলিয়াম কেরি অনূদিত 'নিউ টেস্টামেন্ট'

পরে—সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে ("It is clear that ...burial place of Saint Thomas the Apostle...were entirely the work of the Portuguese"—L.W.Brown)।

এত হল পুরাণ বা mythology। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? উপরোক্ত তত্ত্ব ছাড়াও আরও অন্তত দুটি সম্ভাবনার কথা শোনা যায়। প্রথমটি হল ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে টমাস একা নন, সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর আরও এক গুরু-ভ্রাতা বার্থালোমিউ। আর দ্বিতীয়টি হল, ভারতে এই ধর্মের বার্তা বয়ে এনেছিলেন সিরিয়া কিংবা পারস্য থেকে আগত একদল খ্রিস্টান। প্রথম সম্ভাবনাটির কথা Woba James তাঁর *History of Christianity in India* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—তাঁর মতে দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আগত Pantaenus নামক এক ইহুদি এদেশে এসে ভারতীয় খ্রিস্টধর্মীদের কাছে হিব্রু ভাষায় লিখিত ম্যাথু-কথিত বাইবেলের একটি কপি দেখতে পান এবং অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে এই অতি প্রাচীন গ্রন্থটি তাদের পূর্বপুরুষেরা পেয়েছিলেন সেন্ট বার্থালোমিয়োর কাছ থেকে। Acts of Bartholomew অনুযায়ী ভারতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে Fernando এবং Gispert-Sauch তাঁদের *Christianity in India* বইটিতে মন্তব্য করেছেন, "Bartholomew seems to have made no permanent impact on India and probably did not remain here, if he ever came." অপর যে সম্ভাবনাটির কথা অনেক ঐতিহাসিকেরাই উল্লেখ করেন, তা হল ভারতে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটে পশ্চিম

এশিয়া থেকে কারণ এই অঞ্চলের সঙ্গে কেরালার বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহুকালের। সেক্ষেত্রে দু-ভাবে এই যোগাযোগ ঘটে থাকা সম্ভব—একটি হল চতুর্থ শতকে পারস্য থেকে Thomas of Cana নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে এদেশে পৌঁছন ধর্মযাজক সহ অনেক খ্রিস্টান পরিবার যাদের মাধ্যমে দীক্ষিতরা Cnai Thomman নামে পরিচিত। এভাবেই Syrian Christian-দের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় যার ফলে ভারতীয় খ্রিস্টানদের Syrian Christian বলে অভিহিত করা শুরু হয়। এখনও কেরালার দক্ষিণ প্রদেশের খ্রিস্টানরা নিজেদের Thomas of Cana-র দীক্ষিতদের বংশধর বলে দাবি করেন। অন্যদিকে উত্তর অংশের খ্রিস্টানরা Saint Thomasএর ধর্মীয় উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন বলে বিশ্বাস করেন। পরবর্তীকালে আরও একদল খ্রিস্টান নবম ও দশম শতাব্দীতে সরাসরি সিরিয়ান চার্চ থেকে কোল্লাম অঞ্চলে এসে পৌঁছান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দু-জন ধর্মযাজক—Sapor এবং Prot, যাদের আর্মেনিয়ান বলে ধারণা করা হয়। এঁরাও স্থানীয় শাসকদের থেকে প্রভূত জমিজমা ও সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলেন ধর্মপ্রচারের কাজে। উৎস যাই হোক-না কেন, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে ভারতে খ্রিস্টধর্মের যে শাখাটি প্রথম এসে পৌঁছোয়, সেটি Eastern Orthodox Church এর অন্তর্গত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করে নেওয়া ভালো, খ্রিস্টধর্মের উত্থানের প্রথম চারশো বছরের মধ্যেই সেটি দুটি মূল ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়—East ও West; অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রাচ্য—পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। প্রাচ্যের চার্চগুলির মূলত পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকাতে প্রভাব

বিস্তার করেছিল যাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল বাইজেন্টিয়াম বা কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে তুরস্কে অবস্থিত ইস্তাম্বুল), এথেন্স, মস্কো। এই Eastern Orthodox চার্চগুলি পরবর্তী কালে আবার দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়—Oriental Orthodox Church এবং Eastern Church; এদের মধ্যে প্রথমটি পূর্ব ইউরোপে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়াতে বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে West অর্থাৎ পাশ্চাত্যের চার্চগুলি বলতে বোঝায় পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন চার্চসমূহ—যাদের রোমান ক্যাথলিক চার্চ বলা হয় এবং প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ যার উদ্ভব ষোড়শ শতকে মার্টিন লুথার, জন কেলভিন প্রমুখ প্রতিবাদী 'সংস্কারক' ধর্মনেতার তৎপরতায়। ভারতে অবশ্য এই পশ্চিমের চার্চের বিস্তার ঘটেছে অনেক পরে। সব মিলিয়ে সেন্ট টমাসের তত্ত্বটিরই সারবত্তা বেশি মনে হয়; কারণ প্রাচীন বেশ কিছু লেখাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকের শেষ কিংবা পঞ্চম শতকের শুরুতে সেন্ট জেরোম লিখছেন, "Christ lives everywhere, with Thomas in India and with Peter in Rome." তাছাড়া Ephrem of Syria রচিত প্রার্থনাগীতে সেন্ট টমাসকে অন্ধকারময় ভারতে আলোর দূতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—"A dark night then India's land enveloped,/ Like the sun's ray Thomas did dark forth;/ There he dawned, and her illumined…"। অন্তত সাতটি চার্চের নির্মাতা হিসেবে টমাসের নাম পাওয়া যায়। কেরালার লোকগাথায় তাঁর অলৌকিক কীর্তিকাহিনি আজও খ্রিস্টানদের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হিন্দুদেরও মুখে মুখে ফেরে। শুধু তো নিম্নবর্গের অবহেলিত

হিন্দুরাই তাঁর কাছে খ্রিস্টধর্মের পাঠ নেননি, ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন অনেক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরোহিতেরাও। কথিত আছে, Palayur নামক স্থানে নদীতে তর্পণরত ব্রাহ্মণদের সামনে টমাস নিজের তর্পণ করা জল ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করলে তা আর নিম্নে পতিত হয়নি। আর এই অলৌকিক বিভূতি দেখেই কট্টর ব্রাহ্মণদের অনেকেই তাঁর শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

৪

এভাবেই ইতিহাসের সঙ্গে মিথের নিবিড় বুনন ঘটতে থাকে বারংবার। আজ কাল-পারাবারের এ-পারে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করা বোধ হয় আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তবে যেটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে বিচার করা সম্ভব তা হল, বাস্তবে জিশুর মৃত্যুর তিরিশ বছরের মধ্যেই সুদূর প্যালেস্টাইন থেকে ভারতে টমাসের ধর্মপ্রচার করতে আসা সম্ভব ছিল কি-না। এ প্রশ্নের উত্তরে স্মরণ করা যেতে পারে যে খ্রিস্টের জন্মের বহু আগে থেকেই 'Silk route' ধরে ভারত, তথা প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে গ্রিস, রোম সহ অনেক দেশেরই যোগাযোগ ছিল। গ্রিক সেনানায়ক সেলুকাসের কন্যার সঙ্গে রাজা চন্দ্রগুপ্তের (গ্রিকে স্যান্ড্রোকোটাস) বিবাহের কথা তো সুবিদিত। কোয়েম্বাটুর, কালিকটসহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত বিদেশি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা থেকে বিদেশি যোগাযোগের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এযাবৎ গুন্দফারের নামাঙ্কিত বহু স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা পাঞ্জাব ও পাকিস্তান থেকে পাওয়া গেছে যার একদিকে

পালি ও অন্যদিকে গ্রিক ভাষা লিপিবদ্ধ আছে। অতএব রাজা গুন্দফারের গ্রিক যোগাযোগের দাবি আর উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, টমাস প্রথমে উত্তর ভারতে পৌঁছোন কারণ গুন্দফারের রাজত্ব ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তবে অপর মত অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতে টমাস খ্রিস্টানদের আধিক্য থেকে এটাই ধারণা লাভ করা যায় যে টমাস দক্ষিণ ভারতেই আগে এসেছিলেন অথবা সমধিক কাল এখানেই কাটিয়েছেন। যেহেতু সে-যুগে কেরালাতেই অবস্থিত ছিল প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর, অতএব এই দাবির যৌক্তিকতা অধিক। তদুপরি আছে বহুজন্ম লালিত বিশ্বাস, সযত্নে রক্ষিত বংশাবলি, লোকাচার—লোক-গীতে প্রতিপালিত লৌকিক ইতিহাস। এখনো অন্তত চারটি ধর্মান্তরিত নাম্বুদ্রি পরিবারের বংশতালিকা উৎসমূলে টমাসের প্রত্যক্ষ দীক্ষিত পূর্বপুরুষের নামের সাক্ষ্য দেয়। ফলে পারিপার্শ্বিকতার দাবিতে এটিই সবথেকে উজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে Woba James এর মন্তব্য, "The circumstantial evidences are more in favour of the South Indian apostolate of Thomas"। একই ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখে, যখন দিল্লিতে Saint Thomas Day-র অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "Remember, Saint Thomas came to India when many of the countries of Europe had not yet become Christian and so those Indians who trace their Christianity to him have a longer history and a higher ancestry than that of Christians of many of the

European countries. And it is really a matter of pride to us that it so happened.”

এরপর কেটে গেছে চারশো বছর। চতুর্থ শতকে ভারতে আসেন আরেক টমাস, Thomas of Canna—যার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। তারপর আরও কিছু ধর্মপ্রচারক বিভিন্ন সময়ে এদেশে এলেও ঐতিহাসিক ভাবে তাঁদের গুরুত্ব ততটা নয়। পরবর্তী একহাজার বছরের ইতিহাস মোটামুটিভাবে ঘটনাবিহীন। তবে অন্তত চারটি ঐতিহাসিক দলিলে দক্ষিণ-ভারতের এই সময়ের খ্রিস্টধর্মিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমটি ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের অ্যাংলো স্যাক্সন রিপোর্ট যেখানে রাজা আলফ্রেড কর্তৃক দুজন বিশপকে সেন্ট টমাসের সমাধি পরিদর্শনে প্রেরণ করার এবং অর্থসাহায্য পাঠানোর উল্লেখ আছে। এরপর ১২৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে John of Monte Corvino নামে এক মিশনারি এবং বিখ্যাত ভূপর্যটক মার্কো পোলোর মায়লাপুরে এই পুণ্যতীর্থ দর্শনের কথা বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়—“[…] the place where lieth the body of St. Thomas the Apostle, and the miracles thereof”। এরপর ১৩২১-২৩ সালে Jordanus Catalini নামে এক ডমিনিকান পাদ্রির মাধ্যমে মুম্বই-এর কাছে থানে অঞ্চলে তিনশত ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করার উল্লেখ আছে।

ভারতে খ্রিস্টধর্মপ্রচারের নতুন যুগের সূচনা হয় ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁদের মাধ্যমেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে এক ঐতিহাসিক ঘোষণার (Bull Roman Pontifin) মাধ্যমে পোপ পঞ্চম নিকোলাস নব আবিষ্কৃত প্রাচ্যের দেশগুলিতে পর্তুগিজদের এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে স্পেনকে খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের অধিকার (Padroado) দান করেছিলেন। অতএব ১৪৯৮-এর ২০ মে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে যখন ভাস্কো দা গামা-র চারটি ছোটো-ছোটো জাহাজ এসে ভিড়ল, তখন শুধু যে ভারতের মশলাবাণিজ্যের দ্বার পশ্চিমের দেশগুলিতে খুলে গেল তাই নয়, ধর্মপ্রচারের নতুন দিগন্তও উন্মোচিত হল; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভাস্কো দা গামা-র বিখ্যাত উক্তি, "We come to seek Christians and spices"। এইসময় ভারতের Paravas গোষ্ঠীর মুক্তাচাষি-রা আরবি মুসলিমদের দ্বারা শোষিত হত। তারা পর্তুগিজদের কাছে সাহায্য চাইলে বিনিময়ে পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন তাঁদের ধর্মান্তরিত হবার প্রস্তাব দেন। তারা সম্মত হয়। এভাবে ভারতে গড়ে উঠতে থাকে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ১৫৩৫-১৫৩৭-এর মধ্যে ত্রিশটি গ্রামের কুড়িহাজারের বেশি মৎস্যজীবি ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনগণ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে 'ফিরিঙ্গি খ্রিস্টান'-দের যে গোষ্ঠী গড়ে উঠতে লাগল, টমাস খ্রিস্টানদের থেকে তাদের কিন্তু বিস্তর ফারাক। রোমান প্রভাবমুক্ত টমাস খ্রিস্টানদের রীতিনীতি অনেকটাই ভারতীয় ধাঁচের ছিল। তাঁদের পাদ্রিরা বিবাহ করতে পারতেন। তাছাড়া ব্যাপ্টিজমের নিয়ম, বিয়ে ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতিও রোমান ক্যাথলিকদের থেকে অনেকটা আলাদা ছিল যা পর্তুগিজদের আপত্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে টমাস

খ্রিস্টানরাও পর্তুগিজদের খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান, চারিত্রিক লঘুতা অপছন্দ করত। ফিরিঙ্গিদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাও তারা মেনে নিতে পারেনি।

ধীরে-ধীরে এদেশে পর্তুগিজদের আধিপত্য বাড়তে শুরু করলে জেসুইটদের আসার পথ প্রশস্ত হল। যে-সব জেসুইট মিশনারি এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং রবার্ট ডি নোবিলি। সেইন্ট জেভিয়ার ভারতে এসে পৌঁছোন ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে। সেই সময় ভারতীয় খ্রিস্টানরা চার্চ-সার্ভিসের অভাবে এবং বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় খ্রিস্ট ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। জেভিয়ার এই সকল পথভ্রষ্ট 'মেষশাবক'-দের ফিরিয়ে আনার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন শিশুদের। মূলত তাঁদের মাধ্যমেই প্রভু জিশুর বাণীর সারমর্ম সহজসরল ভাষায় তিনি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রচুর মানুষের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ে মানাপ্পার থেকে ত্রাভাংকোর উপকূলে, মায়লাপুর থেকে মালাক্কায়। তামিল ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে তিনি স্থানীয় মানুষদের অনেক কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন। একটা ঘণ্টা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি সকলকে আহ্বান করতেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল—আগে দীক্ষাদান, পরে শিক্ষাদান। সম্ভবত ইসলাম ধর্মের ক্রমপ্রসারের প্রেক্ষিতেই তিনি দীক্ষিতদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন। ভারত থেকে তিনি জাপানেও গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারে। পরবর্তীকালে এদেশে ফিরে এলেও আবার তিনি

রওনা হন চীনের পথে, কিন্তু যাত্রাপথেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর। জেভিয়ার সেইন্টরূপে স্বীকৃত হন ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে।

সেইন্ট জেভিয়ারের মৃত্যুর চার বছর পরে দিল্লির মসনদে আরোহণ করলেন সম্রাট আকবর। ভারতের ইতিহাসে সূচিত হল এক নতুন যুগ। পরধর্মসহিষ্ণু, উদারচেতা আকবর ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মগুলির সারসত্য জানার জন্য উন্মুখ ছিলেন এবং সকল ধর্মের মানুষকেই তাঁর রাজত্বে স্বীয় ধর্মাচরণের প্রভূত সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ছিল সর্বধর্মসমন্বয়ের এক আন্তরিক প্রয়াস। আকবরের আহ্বানে খ্রিস্টধর্মের বার্তা নিয়ে মোগল রাজসভায় এসে পৌঁছোয় একে একে তিনটি জেসুইট মিশন—১৫৭৯, ১৫৯১ এবং ১৫৯৫ অব্দে। যদিও তাঁরা আকবরকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তবু আকবর ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের এদেশের জনগণকে ধর্মান্তরিত করার অনুমতি দিয়ে এক রাজকীয় সনদ দান করেন। ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে এটি অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সর্বভারতীয় সম্রাটের কাছ থেকে আনুকূল্য লাভ করায় মিশনারিদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিল। মোগল চিত্রকলায় ও পারসি সাহিত্যে খ্রিস্টীয় প্রভাবও এরই ফলশ্রুতি।

ঠিক এই অনুকূল পরিস্থিতিতে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে এসে পৌঁছান আরেক উল্লেখযোগ্য জেসুইট—রবার্ট ডি নোবিলি—ইতালির এক অভিজাত তরুণ মিশনারি। খ্রিস্টধর্মের

ভারতীয়করণে এঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম মিশনারি যিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের আস্থা অর্জনের জন্য তিনি উপবীত ধারণ, ব্রাহ্মণ রাঁধুনির রান্না নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ, নিম্নবর্গের মানুষদের সংসর্গ পরিহার প্রভৃতি রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষা করে বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন এবং নিজেকে 'Apostle of Brahmin' ও নিজ প্রচারিত ধর্মকে 'প্রকৃত বেদ' (True Veda) বলে প্রচার করেন যা তাঁর মতে জিশুখ্রিস্টের দিব্যজীবনে মূর্ত হয়েছে। নিজগৃহের বাইরে তিনি তামিল ভাষায় লিখে রেখেছিলেন, "I am not a parangi [...] I came from Rome, where my family holds the same rank as respectable rajas in this country [...] the law which I preach is the law of the true God [...] for the true God is not the God for one race, but the God of all." তাঁর সন্ন্যাসীর মতন জীবনযাপন, বৈদিক সাহিত্যে পাণ্ডিত্য, 'ফিরিঙ্গি'-দের সঙ্গে সংস্রবত্যাগের কারণে অনেক উচ্চবর্ণের মানুষের কাছেই তিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণদের উপবীত ও শিখা ধারণ, কপালে চন্দন-লেপন ইত্যাদি সনাতন রীতিনীতিও অনুমোদন করেন। এমনকি তিনি জাতিভেদ ব্যবস্থাও মেনে নেন এবং ভারতীয় রীতিতে চার্চের নির্মাণ করেন যেখানে নিম্নবর্ণের মানুষদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা ছিল। পোঙ্গল উৎসবপালনের শুধু অনুমতিই নোবিলি দেন নি, এই উপলক্ষ্যে অনেক গানও রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন খ্রিস্টীয় ধারণা বোঝানোর জন্য তিনি বহু তামিল শব্দের উদ্ভাবন করেন।

বহু খ্রিস্টান সেইন্টদের নামেরও তিনি তামিলীকরণ করেছিলেন। তবে তাঁর কাজকর্মে মৌলবাদী খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তিনি স্বয়ং হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন—এইরকম ধারণা প্রচারিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দীক্ষাদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। নোবিলি অবশ্য নিজের মিশনের সমর্থনে সেন্ট পলের উল্লেখ করে বলেছিলেন—সেন্ট পলও ইহুদিদের সঙ্গে ইহুদিদের মতো এবং Gentile-দের সঙ্গে Gentile-দের মতো আচরণ করেছেন। আবার খ্রিস্টানরাও বহুক্ষেত্রে বহু রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন Pagan সংস্কৃতি থেকে। সর্বোপরি গ্রিক তথা মিশরীয় অগ্নিদেবতার আরাধনায় আলোর উৎসব পরবর্তীকালে ইস্টারের অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠেছে। এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ধর্মপ্রচারে অন্তরায় না হয়ে বরং সহায়ক হয়ে উঠেছে, এমনটাই ছিল নোবিলির মত। অবশেষে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরি নোবিলির মতবাদ মেনে নেন। সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ভাষায় নোবিলির লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। তবে হিন্দু ধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতি গ্রহণ করলেও নোবিলি কর্মফল ও জন্মান্তরবাদকে অস্বীকার করেছেন এবং অবতারতত্ত্বেরও প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু ধর্মের অন্তঃসারকে বর্জন করে তিনি শুধু এর বাহ্যিক আচরণকেই গ্রহণ করেছিলেন স্বীয় ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে। নোবিলির ধর্মপ্রচারের পদ্ধতিতে তৎকালীন খ্রিস্টানেরা সন্তুষ্ট না-ই হতে পারেন, কিন্তু তাঁর অভিনব ও আন্তরিক চেষ্টাতেই খ্রিস্টধর্ম 'ফিরিঙ্গি' তকমা ছেড়ে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে শুরু করে—এ কথা অনস্বীকার্য।

ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। রাজনীতি ও অর্থনীতির থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-কে পৃথক রাখা কঠিন—সেসব যুগেই। পর্তুগিজ, ডেন, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসিরা পৃথিবীর নানাপ্রান্তে কলোনি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারের অভিযানও শুরু করে দিয়েছে। এদের মধ্যে পর্তুগিজ, ফরাসি, স্প্যানিশরা ছিল রোমান ক্যাথলিক। অন্যদিকে ডাচ, ডেন ও ব্রিটিশরা ছিল প্রটেস্ট্যান্ট—যদিও ব্রিটিশরা একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তী ধারা, অ্যাংলিকান চার্চের অন্তর্গত ছিল। যেহেতু পর্তুগিজরা এ-দেশে প্রথম পৌঁছেছিল, ফলে এখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিস্তার ঘটেছে আগে। টমাস খ্রিস্টানরা যেহেতু একটি স্বতন্ত্র ধারা—সিরিয়ান চার্চ-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, ফলে পর্তুগিজদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল যতটা সম্ভব তাঁদের 'Latinize' করা-যা গোটা ষোড়শ শতক ধরে এই দুই ধারার খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়ে উঠেছিল। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে আগমন ঘটে প্রোটেস্ট্যান্টদের। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রেডেরিকের নির্দেশে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই ভারতের মাটিতে পৌঁছোন দু-জন জার্মান মিশনারি—Bartholomew Zigenbalg এবং Henry Pluetschau। অনেক দুর্যোগ ও অসহযোগিতার মধ্যে দিয়ে তাঁদের যাত্রা শেষ হয় ত্রাবাঙ্কুরের মাটিতে। স্থানীয় ভারতীয়দের সাহায্যে তাঁরা পর্তুগিজ ও তামিল ভাষা শেখেন ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে। তাঁদের মাধ্যমে প্রথম বার ব্যাপ্টিজম ঘটে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে। এর আটবছরের মধ্যে এঁরা মূল হিব্রু ও গ্রিক বাইবেল থেকে তামিল ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের তামিল অনুবাদ প্রকাশ করে ছিলেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টেরও কিছুটা অনুবাদ তাঁরা করতে পেরেছিলেন। দেশি ভাষায় এই প্রথম বাইবেলের আত্মপ্রকাশ—নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এছাড়াও তাঁরা তামিল-জার্মান অভিধান ও ব্যাকরণ বইও রচনা করেন। Zindelbalg-এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল প্রথমবার সম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে চার্চ নির্মাণ করা—যাকে যথার্থ অর্থেই বলা যাবে 'in India and part of India'। তৈরি হল নিউ জেরুসালেম চার্চ। তিনি তামিলদের বিবাহ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের রীতিনীতিকেও আংশিক অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং ভারতীয় ভঙ্গিতে প্রার্থনাসঙ্গীতের মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য অনেক গীতরচনা করেন। নোবিলির সঙ্গে মিলটা চোখে পড়ার মতন। এবং একথা খেয়াল করলে আমরা একটু শ্লাঘা-ও অনুভব করব যে, এই সুদূর ভারতবর্ষে এসে ধর্মপ্রচারের কাজ করতে গিয়ে, অন্তত পদ্ধতিগত দিক দিয়ে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট—এই দুই যুযুধান প্রতিপক্ষকে একই কৌশলের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সারা ইউরোপ-ব্যাপী 'সংস্কার' (Reformation) বিতর্কের যা ছিল অন্যতম একটি কারণ—ত্রাণের পথ হিসেবে জিশুর দেওয়া নির্দেশের সঠিক ব্যাখ্যা—সেই ল্যাটিন 'পেনিটেন্সিউম অ্যাজিটে' ('Poenitentiam agite'>Penitenziagite) আর গ্রিক 'মেটানইটে' (Metanoeite) সেদিন মিলে মিশে এক হয়ে গেছিল।

এইসব সংশ্লেষ এত বিস্ময়কর, এত অপ্রত্যাশিত যে এগুলোর ইতিহাস বিবৃত করার সময় কেবলই মনে হয়, সত্যি-ই ভারতবর্ষ আসলে এক অলীক রূপকথার নাম !

৫

এবার একটু চোখ ফেরানো যাক তৎকালীন বঙ্গদেশে।

ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ঘটেছিল পর্তুগিজদের মাধ্যমে। ১৫৯৯-এ নির্মিত ব্যান্ডেল চার্চকেই বাংলার প্রাচীনতম চার্চ মনে করা হয়। শাজাহানের সময়ে মোগলদের আক্রমণে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পরে পুনর্নির্মিত হয় ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে। অনুতপ্ত সম্রাট ৭৭৭ বিঘা জমিও দান করেছিলেন চার্চের জন্য। তবে বাংলায় খ্রিস্টধর্মের প্রসারের কৃতিত্ব অবশ্যই শ্রীরামপুর মিশনের যার প্রধান তিন ব্যক্তিত্ব ছিলেন উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও যোশুয়া মার্শম্যান—সকলেই ব্যাপ্টিস্ট মিশনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্রিট-খ্রিস্টান। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি ডেনমার্ক অধিকৃত শ্রীরামপুরে গঠিত হয় এই মিশন। উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও শিক্ষাবিস্তার। কিন্তু সেজন্য না-ছিল উপযুক্ত বইপত্র, না-ছিল পরিকাঠামো। অবিচল নিষ্ঠায়, দ্রুত দেশীয় ভাষা শিখে নিয়ে উইলিয়াম কেরি ব্রতী হলেন উপযুক্ত গ্রন্থ রচনায়। তাঁর হাতে রচিত হল বাইবেলের প্রথম বাংলা অনুবাদ। এরপর একের পর এক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে—অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, দেশীয় চিরায়ত সাহিত্য। বাংলা ছাড়াও ওড়িয়া, মারাঠি, হিন্দি, অসমীয়া ও সংস্কৃত ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেছেন এই অসামান্য পণ্ডিত মানুষটি—ত্রিশ বছর ধরে বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপনা করেছেন শ্রীরামপুর কলেজে। এই ভিনদেশি পণ্ডিতের আগ্রহেই প্রথমবার ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে

বহু দেশীয় ভাষা—যার হরফ নির্মাণের কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে এই মফস্‌সলের প্রেসটির। প্রথম সংস্কৃত ও মারাঠি ব্যাকরণ গ্রন্থ ছাপা হয়েছিল এই প্রেস থেকেই। কেরির বাসভবন—যা শ্রীরামপুর কলেজে পর্যবসিত হয়েছিল—একাধারে ধর্মীয় শিক্ষার খেতাব দান করত, পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক বিষয়েও শিক্ষাদান করত। বহু দুর্যোগ, বিরোধিতা, অর্থকষ্টের মধ্যেও এই কলেজ তথা মিশন বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সারে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের অমল জ্যোতিটি রক্ষা করেছিল ১৮৩৭ অব্দ অবধি যা অবশেষে Baptist Missionary Society-র অধীনে হস্তান্তরিত হয়। একটি সূত্র অনুসারে, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলেজের শতাধিক ছাত্রের মধ্যে দশজন ছিল ইউরোপিয়ান, ৫০ জন ভারতীয় খ্রিস্টান। সরকারি ভাষা হিসেবে গুরুত্বের কারণে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজি ভাষা শেখানো শুরু হয়—পাশাপাশি গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, অংক, যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র-র থেকেও শিক্ষাক্ষেত্রে এই মিশনের অবদানই অষ্টাদশ শতকের আধুনিক ভারত-নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। যথার্থই কেরিকে Father of Modern Mission এবং India's First Cultural Anthropologist বলা হয়।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শিক্ষা আইনে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সুপারিশে শিক্ষা-খাতে যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল, তার প্রয়োগ নিয়ে প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই বিতর্কে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এদেশের শিক্ষিত সমাজ। বাংলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ স্বাভাবিকভাবেই চাইছিলেন এ-দেশি শিক্ষার বিস্তারে এই অর্থ ব্যয় হোক। অন্যদিকে

আলেকজান্ডার ডাফ চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ভারত নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হলেও ডাফের ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল এক উদারমনস্ক জ্ঞানপিপাসু তরুণ বাঙালির মধ্যে। তিনি ভারতের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানশিক্ষার আলোকে দূর হোক এদেশের জরাগ্রস্থ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বহুযুগসঞ্চিত কুসংস্কারের শৈবালদাম। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহের মতো কুআচার দূর করতে তিনি ইংরেজি শিক্ষাকেই হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন করেছিলেন শাস্ত্রের মূল তত্ত্বের জারণ-বিজারণটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য—গ্রিক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেছিলেন মূল বাইবেল পাঠ করার জন্য। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ ব্যয়ে *The Percepts of Jesus: A Guide to Peace and Happiness* এই নামে নিউ টেস্টামেন্টের মূল বাণী প্রকাশ করেন—পরবর্তীতে যার যথার্থতা নিয়ে অবশ্য মার্সম্যানের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন তিনি। শ্রীরামপুর মিশনারিদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাবার পর অবিকৃত ঔপনিষদিক শিক্ষার আলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে তিনি গঠন করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। একেশ্বরবাদের এই ভাবাদর্শ শুধু যে সনাতন হিন্দু ধর্মের বহু শতাব্দীলালিত পৌত্তলিকতাকে সমূলে নাড়া দিয়েছিল তাই নয়, বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেও পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মে যেমন প্রটেস্ট্যান্টিজম, হিন্দু ধর্মে তেমনি ব্রাহ্মমত প্রশ্ন করে—যুক্তি দিয়ে, আত্মানুভবের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের পথ

উন্মুক্ত করেছিল। ফলত শিক্ষিত বাঙালি খ্রিস্টানদের অনেকেই পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে আগ্রহী কিংবা দীক্ষিত ছিলেন, এমনটা দেখা যায়। ভাবাদর্শের দিক থেকেও খ্রিস্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও এই দুটি ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। রামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সন্ন্যাস গ্রহণের সন্ধিক্ষণেও তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন মাভৈঃ বাণী। জিশুখ্রিস্টের দিব্য জীবন তাঁকে যে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে এ-কথা তাঁর জীবনী থেকেই জানা যায়।

তবে প্রত্যক্ষভাবে যে এলিট বাঙালি যুবসম্প্রদায় ডাফের শিক্ষানীতির প্রভাবে প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবনও কম ঘটনাবহুল এবং ঐতিহাসিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন ডিরোজিও-র ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩- ১৮৮৫) যিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে দীক্ষিত হন। এরপর দীক্ষিত হন মহেশ চন্দ্র ঘোষ, এ.সি. মজুমদার, গোপীনাথ নন্দী প্রমুখ। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয়রূপে কৃষ্ণমোহন ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের Pastor নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি বিশপ'স কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং সেনেটের মেম্বার নির্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহনকে বাংলা খ্রিস্টীয়-সাহিত্যের জনক মনে করা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে Dialogues on the Hindu Philosophy, Relation between Christianity and Hinduism, Proper Place of Oriental Literature প্রভৃতি।

এছাড়া Encyclopedia Bengalensis এর তেরোটি খণ্ড ও বিভিন্ন ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যগ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন কৃষ্ণমোহন। এই সময়ের আরেকজন বিখ্যাত বাঙালি খ্রিস্টান হলেন লালবিহারি দে। সুবর্ণবণিক পরিবারের এই সন্তানের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মধ্যে যেন নিহিত ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবহেলার এক জাজ্বল্যমান প্রতিবাদ। চার্চেও তিনি ভারতীয় পাদ্রি ও ইংরেজদের মধ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষার সমর্থনে এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার ব্যবহারের দাবিতে। তিনি ন্যাশনাল চার্চ অভ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছিলেন। ‘অরুণোদয়’ পত্রিকার সম্পাদনা, ‘Bengal Magazine’ পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন—“Charles Darwin among others was charmed by Dey’s vivid description of rural Bengal” (Christianity in India, Penguin)।

এবং মধু-কবি। কবি মধুসূদন দত্ত—বাংলার নবজাগরণের আকাশে যার আবির্ভাব ও প্রস্থান ক্ষণস্থায়ী ধূমকেতুর মতো। অভিজাত পরিবারের এই মেধাবী সন্তানটির খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কারণ হিসেবে অবশ্য তাঁর জীবনীকারেরা প্রবল ধর্মানুরাগকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। বরং পিতার মনোনীতা নাবালিকা পাত্রীকে বিবাহ করা এড়াতেই তিনি এই দুঃসাহসিক কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ

করলে ব্রিটেনে যাবার এবং তাঁর ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা-প্রতিভার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাবার সুযোগ ঘটবে, এই দুরাশাও তাঁর মনে ছিল। অবশ্য এ-ও সত্যি যে হিন্দু কলেজে পাঠরত অবস্থায় নব্যবঙ্গ যুবকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিরোজিওর যুক্তিবাদের উত্তরাধিকার তাঁকে শিখিয়েছিল চিরাচরিতকে যাচাই করে নিতে' সমসাময়িকতার নিরিখে। ফলে যদিও তাঁর আধুনিক জীবনীকারের ভাষায়, "তিনি সেই পর্যায়ে খৃস্ট-প্রেমে পাগল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না", তবু তাঁর ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের শিকড় আলগা হতে সময় লাগেনি। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হল 'মাইকেল' মধুসূদন দত্তের নতুন জীবন। ধর্মান্তরের পর খুব সম্ভবত আলেকজান্ডার ডাফের মধ্যস্থতায় নিরাশ্রয় মাইকেল কিছুকাল বাস করেছিলেন এক স্কটিশ মিশনারি, টমাস স্মিথের বাড়িতে। এই ধর্মনিষ্ঠ মানুষটির সান্নিধ্য শুধু যে তাঁকে খ্রিস্টধর্মের ভাবাদর্শ আত্মীকরণে সাহায্য করেছিল তাই নয়—মাইকেলের ধ্রুপদী সাহিত্য ও শেক্সপিয়রপাঠেও প্রকৃত দীক্ষা হয়েছিল এই মানুষটির কাছেই। এরপর বিশপ'স কলেজে পড়াশোনা করার সময় ওখানকার শান্ত গম্ভীর পরিবেশে ও শিক্ষকদের সান্নিধ্যে মাইকেলের খ্রিস্টধর্মের প্রতি নির্ভরতা ও নিষ্ঠা প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ফলে প্রভূত প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তিনি পিতার ধর্ম ও আশ্রয়ে আর ফিরে যান নি। বরং পরবর্তী জীবনে মিশনারি হবার কথা গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন। জীবনীকার গোলাম মুরশিদের মতে, "এই কলেজে (বিশপ'স কলেজ) না পড়লে তিনি পরে যে পণ্ডিতকবি হয়েছিলেন তা হতে পারতেন কিনা, সন্দেহ আছে। আর তিনি খ্রিস্টান না-হলে হিন্দু পুরাণ থেকে কাহিনি নিয়ে তার

গতানুগতিক ব্যাখ্যা না-দিয়ে যে মানবকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তা রচনা করতে পারতেন কিনা, সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে"। মাইকেলের পরবর্তী জীবনের আলোচনা এই লেখায় প্রাসঙ্গিক নয়—যদিও তাঁর বর্ণময় অস্তিত্বের ছটা থেকে এতো অল্প আয়েসে সরে আসা কঠিন বৈকী।

এই সময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য বাঙালি খ্রিস্টান কালিচরণ ব্যানার্জি (১৮৪৭-১৯০৭)। মাত্র সতেরো বছর বয়সে আলেকজান্ডার ডাফের প্রভাবে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে সফল আইনজীবী এই মানুষটি আনন্দমোহন বসু ও রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন—" His simplicity, his humility, his courage, his truthfulness, all these things I have all along admired", বলেছেন গান্ধিজি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সূচনামুহূর্ত থেকে তিনি এর সদস্য ছিলেন এবং প্রগতিশীল আদর্শে নানা সামাজিক কাজে যুক্ত থেকেছেন আজীবন। তাঁর স্মারক লিপিতে লেখা আছে সে-কথা—"[...] a prominent leader in all movements intended to further the spiritual social welfare of his country and whose teaching testified to the truth and power of Christianity." এবার যার কথা উল্লেখ করা হবে, তিনি এই কালিচরণের নিকটাত্মীয় এবং বোধ হয় এঁদের মধ্যে সবথেকে অদ্ভুত চরিত্র— ব্রহ্মবাধব উপাধ্যায়—জন্মসূত্রে 'ভবানীচরণ ব্যানার্জি'। কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের এই

সন্তান তেরো বছর বয়সে উপবীত ধারণ করে ‘দ্বিজত্ব’ প্রাপ্ত হন। কলেজে পড়ার সময় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কেশব সেনের মৃত্যুর পর তিনি ক্রমশই খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন, এবং অবশেষে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ'স কলেজের Reverend Heatonএর মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। অর্থাৎ অ্যাংলিকান চার্চের মাধ্যমে তাঁর খ্রিস্টান-জীবন শুরু হয়—কিন্তু ছ-মাসের মধ্যেই তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়’ নাম গ্রহণ করে তিনি খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে সেইসময় বহু হিন্দু যুবক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। ‘Sophia’, ‘Concord’ প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি ক্যাথলিক মতাদর্শ প্রচার করা শুরু করেন। তবে তাঁর ক্ষেত্রে যেটা ব্যতিক্রমী তা হল, তিনি নিজেকে একজন ‘হিন্দু ক্যাথলিক’ বলে দাবি করতেন এবং গৈরিক বস্ত্র পরিধান করতেন। এ যেন বহু শতাব্দী আগে রোম থেকে আগত ‘খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ’ নোবিলির ভারতীয় প্রতিবিম্ব। ব্রহ্মবান্ধবের বিখ্যাত উক্তি—“By birth we are Hindu and shall remain Hindu till death […] We are Hindu so far as our physical and mental constitution is concerned, but in regard to our immortal souls we are Catholic. We are Hindu Catholic.” এভাবেই বোধ হয় তিনি দুটি ধর্মের মধ্যে এক মেলবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে জীবনের শেষভাগে, মৃত্যুর দু'-মাস আগে তিনি পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই ক্রমপরিবর্তনশীল ধর্মীয় পন্থা এক

সদাজিজ্ঞাসু এবং অস্থির মনের পরিচয় দেয় যে না-পেরেছে সনাতন হিন্দুধর্মকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে, না-পেরেছে খ্রিস্টধর্মকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম শিক্ষকদের একজন এবং তাঁর নির্দেশেই সেই সময় বৈদিক রীতিনীতির অনুকরণে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছাত্রদের একাসনে খাদ্যগ্রহণ নিষেধ ছিল। এমনকি ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রণাম না-করে নমস্কার করত বলে জানা যায়। অবশ্য তাঁর শান্তিনিকেতন ত্যাগের পরে এইসব রীতিনীতিও ক্রমে বর্জিত হয়।

৬

এ তো গেল শহর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের কথা। নদিয়া জেলা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের প্রসারে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিলেন কিছু তথাকথিত ‘অ-শিক্ষিত’, প্রান্তিক মানুষজন যাদের পরিচয় কর্তাভজা সম্প্রদায় নামে। এদের উদ্ভব হয়েছিল চৈতন্যদেব-পরবর্তী যুগে। বৈষ্ণবধর্মের সহজ ভক্তিবাদের যে দিগন্ত চৈতন্যদেব উন্মুক্ত করেছিলেন সর্বসাধারণের জন্য, তাঁর দেহাবসানের পর ক্রমশই তা নানা তত্ত্বে ভারাক্রান্ত হয়ে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল। এইসময় বৈষ্ণবধর্ম আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, সাহেবধনী প্রভৃতি নানা পথে-উপপথে বিভক্ত হয়ে যায়—যারা সহজ ভাষায়, গানে তাঁদের আরাধ্য ঈশ্বরকে নিজের মনের মণিকোঠায় খুঁজে ফিরতেন—লালন ফকিরের গানে যিনি

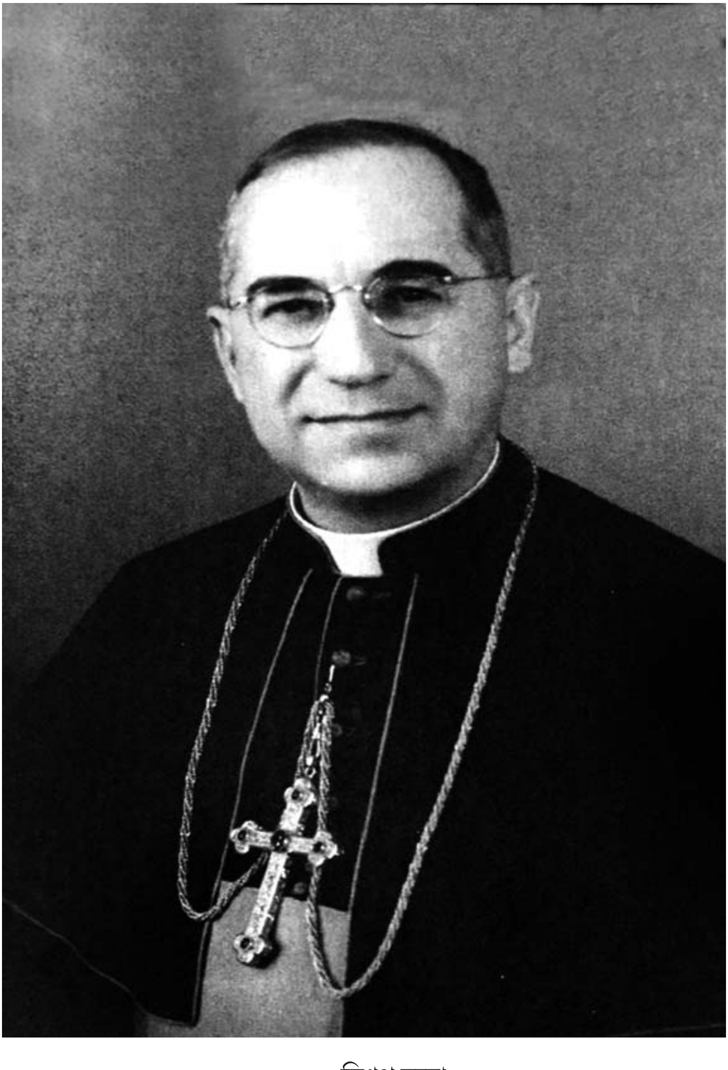

বিশপ মরো

‘মনের মানুষ’, ‘অচিন পাখি’ কিংবা ‘আরশিনগরের পড়শি’। প্রচলিত আচারবিচারের উলটো পথে ছিল এঁদের পথ চলা। পুরাতন তাঁদের পায়ে বেড়ি হতে পারেনি বলেই নূতনকে তাঁরা সহজে আপন করতে পেরেছেন। কর্তাভজারা ছিলেন এঁদেরই একটি ধারা যাঁদের প্রবর্তক ছিলেন আউলচাঁদ। এঁদের প্রধান নিবাস ছিল বর্তমান কল্যাণী শহরের ঘোষপাড়া অঞ্চলে। এঁদের সহজিয়া সাধনপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তথাকথিত ‘নিম্ন বর্গীয়’ মানুষেরা। পাশাপাশি এঁরা তীব্র সমালোচিত হয়েছিলেন সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, অক্ষয় কুমার দত্তের *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *Hindu Castes and Sects*, এমনকি ‘সংবাদ প্রভাকর’-এর মতো পত্রিকায় এঁদের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। এহেন প্রান্তিক মানুষগুলি তাই সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন খ্রিস্টধর্মের প্রতি যখন কৃষ্ণনগর থেকে ছ-মাইল পশ্চিমে দীপচন্দ্রপুরে তিন বাঙালি খ্রিস্টান এই নতুন মানবধর্ম তাঁদের কাছে প্রচার করতে এলেন Rev. William Deerr-এর নির্দেশে। সেটা ১৮৩৫। এর তিন বছর আগেই Deerr সাহেব কৃষ্ণনগরে কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন হাওয়াবদল করতে এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Church Missionary Society (CMS); এরপর ১৮৩৪-এ প্রতিষ্ঠিত হল CMS St. John’s High School, কৃষ্ণনগরের প্রথম মিশনারি স্কুল যা প্রাচীনতায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি ও কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের থেকেও কুলীন। শুরু হল দীক্ষাদান। প্রথম দীক্ষিত হলেন দীপচন্দ্রপুর গ্রামের চণ্ডী নামে এক কর্মকার যিনি

স্থানীয় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন, পরে তাঁরই অনুসারী হন আরও ৩৬ জন গ্রামবাসী। এটা ১৮৩৬-এর কথা। এর দু-বছরের মধ্যে কর্তাভজা গোষ্ঠীর প্রায় ৫০০ মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে-ধীরে নদিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঢেউ—চাপড়া, সোলো, রানাবাঁধ, যোগিন্দাসহ প্রায় পঞ্চাশ মাইল জুড়ে। এইসময় একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল বলা চলে। জলঙ্গি নদীর বন্যায় এই সকল অঞ্চল প্লাবিত হলে মিশনারিরা ত্রাণকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে তাদের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত ছিল তাদের প্রতি যারা ধর্মান্তরে আগ্রহী ছিল তাদের প্রতি। ১৮৩৯-এর মধ্যে দীক্ষিতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এত দ্রুত এত মানুষের মধ্যে এই যে এই নতুন ধর্ম ছড়িয়ে গিয়েছিল, তার কারণ বোধ হয় দ্বিমুখী—প্রথমটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা ও অবহেলা যা এই সহজিয়া মানুষগুলিকে এতদিন প্রান্তিক করে রেখেছিল। দ্বিতীয়টির মূল কিন্তু নিহিত রয়েছে হিন্দুধর্মের অবতারতত্ত্বে—যা এই ধর্মকে দান করেছে নমনীয়তা ও সহনশীলতা। প্রতি যুগেই তাই সাধক অপেক্ষায় থাকে প্রেরিত পুরুষের—নতুন রূপে, নতুন নামে। ফলত এই সঙ্গীতমুখর মানুষগুলি জিশুখ্রিস্টকে সহজেই আপন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের অন্যতম ধর্মগুরু দুলালচাঁদ বা লালশশীর গানে তারা তো অনেক আগেই গলা মিলিয়েছে—"ভেদ নাই মানুষে মানুষে/ খেদ কেন কর ভাই দেশে দেশে"। অতএব জাতপাতের বেড়ি দুহাতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে যারা পথ চলতে শিখেছে, এই নতুন মানব-ধর্ম তো তাদের টানবেই—বিশেষত যেখানে মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান।

ইতিমধ্যে নদিয়ায় এসে পৌঁছেছে ক্যাথলিসিজমের বার্তাও। ১৮৪৫-এ চট্টগ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছোন আবারও এক টমাস, Fr. Thomas Zubiburu, এক পর্তুগিজ পাদ্রি। ১৮৪৬-এ প্রতিষ্ঠিত হল এই শহরের প্রথম ক্যাথলিক চার্চ। তাঁর মৃত্যুর পরে এখানে আসেন Fr. Luigi Limana। সেই সময় শহরে প্রটেস্ট্যান্টদের অনেকেই ক্যাথলিক মত গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এসে পৌঁছন Sisters of Charity-র সন্ন্যাসিনীরা। এঁদের মধ্যে সেবাব্রতের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় Sister Batholomea এবং Sister Vincenza Gerossa। এরপর ক্রমশই চার্চটি সুসংগঠিত হয়েছে Fr. Limana ও Fr. Marietti-র সুযোগ্য পরিচালনায়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর স্থাপিত হয় কৃষ্ণনগর ডায়োসিজ এবং প্রথম বিশপ রূপে দায়িত্ব নেন Msgr. Pozzi। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এক ভূমিকম্পে চার্চটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে একই স্থানে ১৮৯৯ সালে সেটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। কৃষ্ণনগর চার্চের দ্বিতীয় বিশপ ছিলেন Msgr. Taveggia। ১৯২৮ থেকে ডায়োসিজটির দায়িত্ব নেন Salesians of Don Bosco। সেই সময় এটির অন্তর্গত ছিল ১৯টি চার্চ, ৩৭টি চ্যাপেল আর ২৩টি স্কুল। মোট ক্যাথলিকের সংখ্যা ছিল ৬২৫৯। ১৯৩৯ সালে এখানে বিশপরূপে মনোনীত হন L. R. Morrow। কৃষ্ণনগরের মানুষ তাঁকে স্মরণ করেন বিশপ মরো বা 'The Smiling Bishop' নামে। ১৯২৮ থেকে বিশপশূন্য ডায়োসিজটিতে তিনি যখন প্রথমবার এসে পৌঁছলেন, তাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিল একরাশ সমস্যা। বিদ্যুৎ ও জলের খরচ চালানোর মতো অর্থ নেই, স্কুলগুলিতে ছাত্র নেই,

ছাত্রাবাসে দরজা-জানলা নেই, দোতলায় উঠবার সিঁড়ি নেই—কারণ সিঁড়ি বানানোর আর্থিক সামর্থ্য নেই, আছে শুধু একটা লড়ঝড়ে মই। এরকম কর্মক্ষেত্র যেকোনো কর্মবীরকেই একবার থমকে দেবে এটাই স্বাভাবিক। বিশপ মরো কিন্তু থামলেন না। যোগাযোগ করলেন বিভিন্ন মিশনারি সংস্থার সঙ্গে, যদিও খুব আশাব্যঞ্জক কিছু পেলেন না। তাঁর নিজের ভাষায়, "I could foresee that my appointment as Bishop of Krishnagar would mean a great change in my life [...] everything seemed to me so different from what I was accustomed to, in the U.S., in Mexico, and in the Philippines." তিনি প্রথমেই নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করলেন। আমেরিকায় ফিরে নিউ ইয়র্কে তিনি গঠন করেছিলেন 'কৃষ্ণনগর গিল্ড' যা থেকে আর্থিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশপের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কৃষ্ণনগরে ফিরে আসেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর। কিন্তু ততদিনে পৃথিবী জুড়ে কেবলই শোনা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। বিশপ খাদ্যের জন্য কলকাতায় ছুটলেন সৈনিকদের কাছে। অনেকেই তাঁকে বিমুখ করেননি। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ-লক্ষ মানুষ যখন প্রাণ হারাচ্ছেন, বিশপ মরো নিজের সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আর্ত মানুষের ত্রাণে। তাঁকে Voluntary Citizens' Food Committee'-র চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়, সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুধীর চন্দ্র মল্লিক। উভয়ের আন্তরিক চেষ্টায় নানা জায়গা থেকে খাদ্যসংগ্রহ চলতে থাকে। বিশপ মরো কলকাতা

থেকে সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত খাদ্য অনাহারী মানুষদের জন্য জোগাড় করে আনলেন। নিউ ইয়র্কে 'Catholic Relief Society'-র সঙ্গে যোগাযোগ করেও প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করলেন। বলা চলে, তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু মানুষের জীবন রক্ষা পায়। এভাবেই ধর্মীয় পরিচয় ভুলে বিশপ মরো যথার্থই 'Father to All' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃষ্ণনগরে সেই সময় দুটি মিশনারি স্কুল ছিল—ছেলেদের জন্য Don Bosco School এবং মেয়েদের জন্য Holy Family School। তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা, সঙ্গীত, প্রযুক্তিবিদ্যা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নির্মাণ। ছাত্রদের মিউজিক ব্যান্ডের জন্য ইতালি থেকে সমস্ত বাজনাও আনিয়েছিলেন সেই কঠিন সময়েও। যেমন আনিয়েছিলেন প্রযুক্তিবিদ্যা শেখানোর জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিদেশ থেকে। প্রতি বছর কৃষ্ণনগর টেকনিক্যাল বিদ্যালয় থেকে একগুচ্ছ দক্ষ ছাত্র কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। এভাবে বিশপ মরো আর্থিক স্বাবলম্বনের পথ দেখিয়েছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও সমান মনোযোগী ছিলেন বিশপ। ১৯৪৮ -এ তিনি Sisters of Mary Immaculate এর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নামাঙ্কিত Bishop Morrow School কৃষ্ণনগরের অন্যতম প্রধান ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়। কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রাল নির্মাণও তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, ভারতের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে জুড়ে ছিল দেশভাগের ক্ষত। নদিয়া জেলা প্রথমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল। সেইসময় নদিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে বিশপ মরোর তৎপরতায় সেই সিদ্ধান্ত বদল হয়, একথা আজও নদিয়াবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডের পর জলঙ্গি নদীর ধারে স্মরণ সভায় খ্রিস্টান প্রতিনিধিরূপে বক্তব্য রাখার সময় তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীকে গান্ধিজির আদর্শ অনুসরণ করে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। ১৯৫২-য় স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনের সময় জনগণের অনুরোধে তিনি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার পদের জন্য ভোটে দাঁড়ালে বিপুলভাবে জয়ী হন। এরপর আরও তিনবার তিনি পুনঃনির্বাচিত হন। এই পদে থাকাকালীন তিনি কৃষ্ণনগরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার মধ্যে আছে পানীয়জলের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, টেলিফোন ব্যবস্থার প্রচলন, শহরের টিবি ক্লিনিকের জন্য এক্স-রে মেশিনের বন্দোবস্ত, স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি। এছাড়াও শিশু-উদ্যান, রামকৃষ্ণ পাঠাগার, শ্রী অরবিন্দ ভবন নির্মাণের মতো বহু জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি মুক্তহস্তে দান করেছেন। কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে তিনি অফিসিয়াল ভিজিটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এভাবে সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে তাঁর কাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জুড়ে গেছে। এই শহর তথা জেলা তাঁর অক্লান্ত সেবায় প্রভূত সমৃদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় পরিচয়ের থেকেও কখন যেন তাঁর সামাজিক পরিচয় আপামর নদিয়াবাসীর মনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। বহু কাল আগে যে লোকসংগ্রহ ও সামাজিক আলোকদানের

কথা প্রথম মিশনারিদের মুখে প্রচারিত হয়েছিল, তার সার্থক ও সফলতম পরিণতি পরিলক্ষিত হয় বিশপ মরোর জীবনে।

বর্তমানে কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মিলিয়ে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা প্রায় কুড়িহাজার। শিক্ষা থেকে চিকিৎসা, প্রযুক্তিবিদ্যা থেকে পরিষেবা—সমাজের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা অবদান রেখেছেন, নানা ভাবে। কৃষ্ণনগরের জনসম্পদের তাঁরা এখন একটি অপরিহার্য অংশ। যেমন অপরিহার্য প্রতি বছর বড়োদিনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল কৃষ্ণনাগরিক তথা নদিয়াবাসীর উৎসবে মেতে ওঠা। কৃষ্ণনগর ক্যাথিড্রালের মতোই এই জেলার প্রতিটি গির্জাই সেদিন হয়ে ওঠে মহামানবের মিলনক্ষেত্র। মানবপুত্রের আবির্ভাবের পুণ্যলগ্নে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন সব ধরণের মানুষ। আলোকমালায় বর্ণময় ওঠে প্রতিটি শহর। ধর্মীয় পরিচয় ভুলে খ্রিস্টমাস যেন হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষতার এক সর্বাঙ্গীণ উৎসব। কৃষ্ণনগরের মতো চাপড়া-সহ বহু জায়গাতেই এক সপ্তাহব্যপী বড়োদিনের মেলায় সমবেত হন হাজার হাজার মানুষ। খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে বহু অখ্রিস্টান পরিবারেও সেজে ওঠে খ্রিস্টমাস ট্রি, উঁকি দেয় সান্তাক্লজের হাসিমাখা মুখ। বড়োদিনের কেকের সুঘ্রাণ ভেসে আসে শীতের কমলা রঙের হাওয়ায়। পুজোর ঢাক-বাদ্যি মিলিয়ে যেতে না যেতেই যে কচিমুখটি ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে দেখেছিল বড়োদিনের আর কত দেরি, তার মুখের হাসিতে কি লেখা থাকে কোনো ধর্মের নাম? অথবা হয়তো থাকে লেখা । সেই ধর্মের নামই 'মানবধর্ম', যার পতাকাতলে এসে মিলিত হয় সকল মতের,

সকল পথের ঈপ্সিত ইষ্ট। এদেশের মাটিতে যে বহু যুগ আগেই ধ্বনিত হয়েছে সেই সর্বধর্মসমন্বয়ের সুর, যা শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে: "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং/ নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব"—পৃথক-পৃথক উৎস থেকে উৎসারিত সকল নদীর জলধারা যেমন একই সমুদ্রে লয় পায়, তেমনি নিজ-নিজ রুচিবৈচিত্র্য অনুসরণকারী সকল পথের উপাসকের একমাত্র গন্তব্য একমেবাদ্বিতীয়ম ঈশ্বর। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ মা মেরির কোলে জিশুর ছবি দেখে খ্রিস্টভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন। আর শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রকৃত আদর্শ, "আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি"। বলেছিলেন, "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না; অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে"। এই সেই অন্তর্নিহিত আদর্শ যা এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে জিশুখ্রিস্টকে আপন করে নিতে আপন ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখেই। রামকৃষ্ণদেবের প্রয়াণের পর যখন স্বামীজি সহ তাঁর সন্ন্যাসী ভক্তরা বরাহনগর মঠে বাস করছিলেন, তখনও তাঁরা বড়োদিন ও গুডফ্রাইডে উৎযাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার শ্রীপ্রমথনাথ বসু লিখেছেন— "বড়োদিনের সময় একটি ধুনি জ্বালিয়া সকলে ধুনির চতুষ্পার্শ্বে অর্ধশায়িত অবস্থায় যীশুখ্রিস্টের জন্মকথা, তাঁহার আবির্ভাববার্তা—প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেন"।

INRI

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠেও বড়োদিনের আরাধনার আয়োজন করেছিলেন যা আজও পালিত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বেলুড়মঠে বড়োদিনের পুজা-আয়োজনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী প্রভবানন্দের ভাষ্য অনুযায়ী— "সেই প্রথম আমি বোধ করেছিলাম যে, খ্রিস্ট আমাদের আরাধ্য কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারদেরই মতো... তাঁকে কখনও বিদেশি বলে মনে হয়নি"। শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথ বড়োদিন পালন করা শুরু করেছিলেন ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। গান্ধিজির জীবনে খ্রিস্টের বিপুল প্রভাব তো সর্বজনবিদিত। তাই-তো গির্জায়-গির্জায় যখন বেজে ওঠে ক্যারলের সুর, বেলুড় মঠ সহ বহু তথাকথিত হিন্দু মন্দিরেও আরাধনা হয় সেই পরমপুরুষের—বেথলেহেমের দীন আস্তাবলে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবজাতির সম্মিলিত পাপ মোচন করতে। বুদ্ধদেব বসুর মতে তাই, "এই জন্ম অলৌকিক"। আর সেই পরম মুহূর্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে এক দূরাগত নক্ষত্রের আলো—যে আলো জানে অন্ধকার থেকে জ্যোতির, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথনির্দেশ। তবে তার আগে আছে ক্রুশকাঠ, আছে এক যন্ত্রণাময় মৃত্যু এবং পুনরুজ্জীবন—এই বড়োদিন যার সূচনামাত্র। তাইতো এই দিনের তাৎপর্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আজ পরিতাপ করার দিন, আনন্দ করার নয়। [...] বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন"। কারণ, আমাদের জীবনে এই মহামানবের জন্মদিন আসে কদাচিৎ, কিন্তু ভালোবাসার জন্য তাঁর অপমানদগ্ধ মৃত্যু ফিরে আসে প্রতিদিন। আমাদের অমৃত দান করতে তিনি গ্রহণ করেছেন নিদারুণ বিষে ভরা পানপাত্র, বহন করেছেন অকৃতজ্ঞ মানবজাতির পাপ ও

ঘৃণার গুরুভার ক্রুশ। অন্তিম মুহূর্তে-ও ক্ষমা ও প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে রেখে গেছেন অমৃতলোকের পথচিহ্ন। তারপর, বৃত্ত সম্পূর্ণ হলে, একাত্ম হয়েছেন তাঁর পিতা, তাঁর প্রভুর সঙ্গে—মিলনের যে দৈবী সুরের মধ্যে যেন মূর্ত হয় ভারতীয় অদ্বৈতবাদ— 'সোঅহং'—" I and my father are one." শ্রী অরবিন্দের অপূর্ব লেখনীতে ধরা থাকে সেই অমৃতগাথা, পন্ডিচেরি-র আশ্রমের নির্জনতায়—

"The Son of God born as the Son of man
Has drunk the bitter cup, owned Godhead's debt,
The debt the Eternal owned to the fallen kind
His will has bound to death and struggling life
That yearns in vain for rest and endless peace…

He who has found his identity with God
Pays with the body's death his soul's vast light.
His knowledge immortal triumphs by his death.
Hewn, quartered on the scaffold as he falls
His crucified voice proclaims, 'I, I am God !"

৭

হ্যাঁ, তাই পঁচিশে ডিসেম্বরও হতে পারে তাঁর জন্মের দিবস— অঙ্কের হিসেব এই গল্পে অবান্তর। গল্পটা এতদিনে বোধহয় খানিকটা পুরোনো হয়ে এলো। তবু, দু-হাজার বছর পরেও এ গল্পটা যে কিছুতেই মরতে চায় না। এক অখ্যাত ক্রুশকাঠের

নীচে, ক্রন্দনরতা এক মা আর তাঁর মুমূর্ষু ছেলের হেরে যাওয়ার অতি লৌকিক এক গল্প-মাত্র হয়েই যা মুছে যাওয়ার কথা ছিল, সেই কাহিনির এই অলৌকিক আয়ু আমাদের অপরাধী করে তোলে—আমাদের বিশ্বাসী করে তোলে। আমরা টের পাই এই গল্পটি আমাদের বহুদিনের পরিচিত—খ্রিস্টাব্দের হিসেব গুনতে শেখার আগে থেকেই আমরা এই গল্পটা চিনতাম। মাঝে বিস্মৃত হয়েছিলাম কেবল।

কেউ কেউ বিস্মৃত হন-নি। হন-না।

যেমন—এক ছুতোর মিস্তিরির সন্তান। যিনি চিরকালের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসকে বদলে দেবেন—যিনি সবকিছু বদলে নেবেন। যিনি হয়ত আমাদের ক্রুশ-ও বানাতে শিখিয়েছিলেন। মানুষকে দিয়েছিলেন ঈশ্বরকে-ও হত্যা করার ক্ষমতা—ঈশ্বরহীন এক পৃথিবীতে নির্বাসন থেকে মুক্তির বদলে।

কিংবা এমন নন তিনি। গ্রিক ভাষায় ‘টেকটন’ শব্দটির অর্থ যে বড়োই সু-বিস্তৃত। শুধুই ‘কারপেন্টার’ নয়। কারিগর। হ্যাঁ—এই ছিল তাঁর পার্থিব পরিচয়। একমাত্র তিনিই জানতেন তাঁর আত্মার প্রকৃত অবয়ব। নিজের রক্তের হিন্দোলের মধ্যে টের পেতেন দেবোন্মত্ত সৃষ্টির গর্জন। অনুভব করতেন এ’ জগৎ তাঁরই রচিত। তবু তাঁর উজ্জ্বল কোষ ঘিরে ছিল সে কোন লাজুক উপবৃত্ত। ঈশ্বর সেদিন একবার এসেছিলেন মানুষীর গর্ভে, পৃথিবীর মানুষকে ফিরিয়ে দিতে তাদের সাম্রাজ্য, আলেকজেন্দার সেল্কার্ক শুনে-

ছিল সমুদ্রের গর্জন কেবলই মিশে যায় কালের ঘণ্টায়; রুটির গরম গন্ধ আর নিছক সম্রাটের নয়—সামান্য মানুষদের অধিকার, অতীতের সমস্ত ছাই তাই গোলাপ হয়ে উঠবেই এবার। ইহুদিদের রাজা তো তাঁর যথেষ্ট পরিচয় হতে পারে না—তিনি মানবপুত্র। তিনি-ই ঈশ্বর। তিনি-ই শূন্য কবর। তিনি-ই সেই হিরণ্ময় আলো।

আর তাই জিশুর উত্তর সেদিন শোনা হয়নি পাইলেটের—প্রশ্নটি আজ ছড়িয়ে গেছে কালান্তরের বাতাসে, শ্রমণদের সঙ্গে। কোনোদিন আবারও বালি থেকে উঠে আসবে সে এক অন্যমনস্ক প্রফেট। চিৎকার করে বলবে, "বাতাসে কান পেতে শোনো—সময় আছে এখনও। এসো, আমি জলের খবর এনেছি। এখনও সুসংবাদ বাকি রয়ে গেছে—নষ্ট হয়নি কিছুই, যদি অনুতাপ জানো। জীবন এখনও আছে, শুক্রবার আসে ওই—আছে, আছে, আছে..."

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. M. R. James, *The New Testament Apocrypha*, The Apocryphile Press, 2004

2. Leonard Fernando and G. Gispert-Sauch, *Christianity In India*, Penguin Books, 2004

3. Robert Eric Frykenberg, *Christianity In India*, Oxford University Press, 2008

4. J.K. Elliot(ed.), *The Acts of Thomas*, The Apocryphal New Testament, Oxford, 1993

5. leslie Brown, *The Indian Christians of St. Thomas*, Cambridge University press, 1956

6. A. M. Mundadan, *History of Christianity in India*, CHAI, Vol-1, 2018

7. Woba James, *History of Christianity in India: A Reader*, Christian World Imprints

8. *Sisters of Mary Immaculate of Bishop Morrow*, Bishop Morrow—A Life

9. Bishop Morrow, *My Catholic Faith*, Chicago university press, 1961

10. Kevin Ward and Brian Stanley, *The Church Mission Society and World Christianity, 1799-1999*, Routledge, 2000

11. 'Christianity Today' Magazine, 'Incredible Indian Christianity', November, 2016

12. Geoffrey A. Oddie, '*Kartabhaja (Vaishnava) Converts to Evangelical Christianity in Bengal, 1835-1845 in Religious Conversion Movements in South Asia: Continuities and Change, 1800—1900*, Routledge, 1997
13. Md. Dilwar Hossain, 'Drifts of Defiance: The Kartabhaja Sect in Bengal, Café Dissenssus, July 19, 2016
14. 'The Roman Catholic Diocese of Krishnagar', http://www.rcdioccackrishnagar.org/
15. Dr. Babu K. Verghese, *Let there be India*, WOC publishing, 2016
16. Rohit Gupta, *Malankara Orthodox Syrian Church*, Notion Press, 2019
17. Siddhartha Sarma, *Carpenters and Kings: Western Christianity and the Idea of India*, Penguin Hamish Hamilton, 2019
18. John Webster, *Historiography of Christianity in India*, OUP India, 2012
19. Francis Prem Henry, *Christianity in India reconsidered*, ATC Publicatios, 2016
20. Sri Aurobindo, *Savitri, A Legend and A Symbol*, Sri Aurobindo Ashram
21. সুধীর চক্রবর্তী, *গভীর নির্জন পথে*, আনন্দ পাবলিশার্স
22. স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়
23. প্রমথনাথ বসু, *স্বামী বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়
24. স্বামী প্রভবানন্দ, *বেদান্তের আলোকে খ্রিস্টের শৈলোপদেশ*
25. গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, আনন্দ পাবলিশার্স

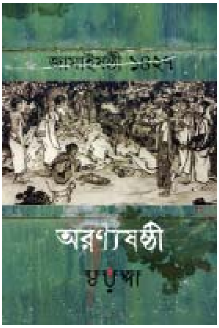

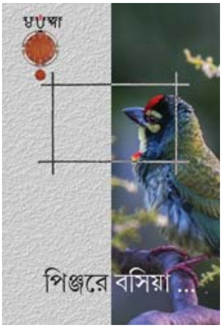

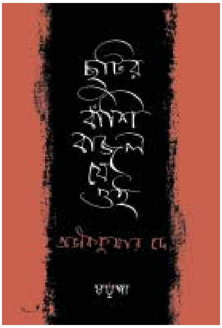

প্রকাশিত হয়েছে সংগ্রহ করুন

ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন

http://harappa.co.in/harappa_booklet.html